“নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রস্তাবিত বাজেট”

অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ, সভাপতি, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক; সহযোগিতায়: বিধান চন্দ্র পাল (২২ জুন, ২০০৯)

প্রাক কথন: অর্থমন্ত্রীর এ যাবৎকালের সবচেয়ে বেশি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১ লাখ ১৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকায় নির্ধারিত করে সংসদে বাজেট উপস্থাপন করেছেন। উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন ব্যয় গত বছরের তুলনায় অনেক বেড়েছে। বাজেটের আয়কাঠামো ও ব্যয়কাঠামো প্রকৃতিগতভাবে আগের বছরের তুলনায় তেমন পরিবর্তিত হয়নি। সর্বাধিক অনুন্নয়ন ব্যয় প্রাক্কলিত হয়েছে অর্থবিভাগ (৬০.১৭%), এর পরে যে সমস্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য বেশি অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে সেগুলো হলো: খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (৭.৩৬%), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (৩.৫৯%), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (৫.১৩%), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (৩.৩৭%), শিক্ষা মন্ত্রণালয় (৩.৯৯%) ও কৃষি মন্ত্রণালয় (৩.২১%)। এ সমস্তই আগের বছরের তুলনায় শতাংশ হিসেবে তেমন ভিন্নতা দেখায় নি। উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগে (২১.২৯%)। তারপরে আসছে বিদ্যুৎ বিভাগ (১১.৩০%), সড়ক ও রেলপথ বিভাগ (৯.৭৬%), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ (৯.৭২%) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা (৯.০৫%)। উল্লেখ্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে বরাদ্দ হয়েছে (৪.১১%), শিক্ষা খাতে (৩.৪১%), কৃষি খাতে (২.৮৩%), সেতু নির্মাণের জন্য (২.৫৩%) এবং জ্বালানী খাতে (২.২৩%)। দিন বদলের বাজেটে আমরা ব্যয়ের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ্য করি না। অন্যদিকে আয়ের ক্ষেত্রেও কর জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং সেজন্য করের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সংস্কারের ওপর পূর্ববর্তী বাজেটগুলোর মতোই অধিক দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ রাজস্বের ৪২% আমদানী শুল্ক থেকে আসে, এবারের বাজেটেও এ খাত থেকে অধিকতর কর রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমনি করা হয়েছে মূল্য সংযোজন খাতের আওতা প্রসারণের জন্য। আয়করের ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী বছরের চাইতে ভিন্নতর কোনো অবস্থান নেয়া হয়নি। রাজস্ব ব্যতিরেকে রাজস্ব বহির্ভূত আয়ের ক্ষেত্রেও একইচিত্র পরিলক্ষিত হয়। বাজেটের ঘাটতি জিপির ৫%-এর মধ্যে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যেটা আগের বছরের চাইতে কিঞ্চিত বেশি। ঋণের বেলায় আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ কিছুটা বাড়বে এবং আভ্যন্তরীণ ঋণ আসবে মূলত ব্যাংকিং খাত থেকে, যেখানে অনেক তারল্য বর্তমানে আছে। বৈদেশিক ঋণের বেলায়ও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং সাম্প্রতিককালের চেয়ে প্রাক্কলিত বাজেটে উন্নয়ন বাজেটের ৫০ শতাংশের বেশি বৈদেশিক ঋণ থেকে আসবে বলে দেখানো হয়েছে। প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি জিডিপির সাড়ে ৫ থেকে ৬ শতাংশ এটা আগের বছরের মতোই। বিনিয়োগ হবে জিডিপির ২০ শতাংশের বেশি, এখানেও ধারাবাহিকতা লক্ষ্যণীয়। মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় মূল্যস্ফীতি প্রায় ১০ শতাংশ হয়েছিল, এখন খাদ্যদ্রব্য মূল্য কম হওয়ায় এবং পেট্রোল ও ভোজ্য তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে কমে যাওয়ায় মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে বলে অনুমান করা হয়েছে। বাজেটে জাতীয় সঞ্চয় জিডিপির কত শতাংশ হবে তার কোনো প্রাক্কলন নেই এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বার্ষিক হিসেবে কত জনবৎসর বৃদ্ধি পাবে তারও কোনো লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট নেই।

নির্বাচনী ইশতেহারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের কথা বলা হয়েছে এবং কৌশল হিসেবে মজুদদারী ও মুনাফাখোরীর সিণ্ডিকেট ভেঙ্গে দেয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। বাজেটে এ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই। দ্রব্যমূল্য কমাতে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে সঙ্গত কারণেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সে সাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ এবং একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কৃষি খাতে প্রয়োজন মোতাবেক ভর্তুকি থাকবে। যার পরিমাণ ২০০৯-১০ সালে ৩,৬০০ কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটের ৫,৭৮৫ কোটি টাকার চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে কম। কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, বীজ সংরক্ষণ ও মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, কৃষি গবেষণা ও কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাতে লক্ষ্যণীয় বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রাও বাড়ানো হয়েছে। কৃষি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কোনো প্রস্তাবনা নাই। লাঙল যার, জমি তার এ দিকেও সরকার অগ্রসর হচ্ছেন বলে মনে হয় না। উপরন্তু কৃষকের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াবার প্রচেষ্টাও অনুল্লেখভাবে বাজেটে এসেছে। বীজ এবং অন্যান্য উপকরণের সমবায়ী মালিকানার প্রতি কোনো প্রাগ্রাধিকার দেয়া হয়নি, যদিও সংবিধানে সমবায়ী মালিকানার ক্ষেত্রটি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পরে এক্ষেত্র অগ্রাধিকারের দাবিদার।

নির্বাচনী ইশতেহারে বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে এর অভিঘাত ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বাজেটে বিভিন্ন খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানা রকমের বিনিয়োগ এবং নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বমন্দার প্রভাব মোকাবেলায় বাজেটে অন্যান্য দেশের মতো বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। রফতানি খাতে সরকার তেরোটি পণ্যকে রফতানি সহায়তা দিয়ে থাকে। উপরন্তু বাজেটে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ তিনটি খাতে সহায়তার পরিমাণ ২.৫ শতাংশ করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এজন্য বাজেট বরাদ্দ ৪২৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে এবং সহায়তার অর্থ দ্রুত পরিশোধের জন্য নীতিমালা সহজীকরণ করা হয়েছে। যার ফলে প্রাপ্য সহায়তার ৭৫ শতাংশ বিলম্ব ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা হবে। তৈরি পোষাক ও বস্ত্র খাতে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা, ডিউটি ড্র ব্যাক সুবিধা, ৫ শতাংশ রফতানি সহায়তা এবং সুতা আমদানির ওপর ০ (শূন্য) শুল্কহার বিদ্যমান রাখা হয়েছে। এছাড়াও আমদানি ও বিনিয়োগ সংহত করতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার ১২ ও ১৩ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে, ব্যাংক ঋণ পরিশোধের ডাউন পেমেন্ট-এর মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কেস টু কেস-এ ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, রফতানির খাতে নিয়োজিত প্লান্ট-এর উন্নতি ও যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ১০০ থেকে ১৫০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের জন্য প্রদেয় লাইসেন্স ও নবায়ন ফি প্রত্যাহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও সকল রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের করণীয় কার্যক্রম আশু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনকে নির্বাচনী ইশতেহারে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কৌশল হিসেবে কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা আনয়ন, হতদরিদ্রদের নিরাপত্তা প্রদান এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের যথাযথ সহায়তা প্রদানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রের বিষয়টি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য পশুসম্পদের বিনিয়োগের মাধ্যমে মাংস, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধি, মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলাশয় ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রণোদনা সহায়তা প্রদানের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ছাড়া এদেশের ভূমি সম্পদের যথার্থ ব্যবহার সম্ভব নয়, সেইসাথে যুক্ত হচ্ছে গ্রামীণ জনশক্তির যথার্থ ব্যবহার। এজন্য প্রয়োজন নদীসহ সমস্ত জলাশয়ের দুষণ ও দখলমুক্ত করাসহ নদী সংরক্ষণ, নদী ভাঙন রোধ, লবণাক্ততা প্রতিরোধ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ। নদীর নাব্যতা ও টেকসই পুনরুদ্ধার আমাদের জলসম্পদের ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করতে পারে। বাজেটে এ ব্যাপারে অতীতের মতোই যথেষ্ট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো সম্প্রসারণ, গ্রামীণ বিদ্যুৎতায়ন, গ্রামীণ স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি সরবরাহসহ পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে ঋণ দান, দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ছাড়াও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলজিইডির অনকূলে উন্নয়ন বরাদ্দের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্কটি যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন নয়। বাজেটে সার্বিক ত্রাণ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর আর্শিবাদপুষ্ট একটি বাড়ি একটি খামারকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হলে জেলাভিত্তিক ও মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেটের ওপর নেকদৃষ্টি লক্ষ্যণীয়, যখন স্থানীয় সরকারের কার্যকারিতা বাড়াতে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের পৃথক ও সমন্বিত বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বর্তমান সরকার আগের মতোই টিআর, ভিজিএফ, কাবিখা ছাড়াও বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মায়ের ভাতা বৃদ্ধি ও ক্ষেত্র প্রসারণের প্রস্তাব করেছে। এছাড়াও পিতৃ-মাতৃহীন শিশুর কল্যাণ, পথশিশুদের কল্যাণ, দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান, প্রতিবন্ধী সেবা, দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান, সৃজনমূলক প্রশিক্ষণ, মেটার্নাল হেলথ ভাউচার ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র্যের অভিঘাত সীমিত করার প্রচেষ্টা ও কর্মপ্রস্তাবনা বাজেটে লক্ষ্য করা যায়। এ সমস্তই দান-অনুদানের ব্যাপার। দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টি, শিক্ষা ও কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদনে অংশিদারিত্বসহ সম্পদ প্রবাহের সাথে সম্পদ সৃষ্টি বিপণন ও এর লভ্যাংশের সাথে অর্থবহ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান না করা হলে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয় না। এ কারণে সুদীর্ঘকালে এ অঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও হতদরিদ্রের সংখ্যা তেমন কমেনি, দারিদ্র্য রেখার নীচের মানুষের সংখ্যাও শতাংশ হিসেবে কমলেও জনমিতি হিসেবে বেড়েছে এবং বিভিন্ন কারণে ঝুঁকির মুখে থাকা দারিদ্র্য সীমার একটু ওপরে থাকা মানুষের সংখ্যা নগণ্য নয়। এই তিন শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ। একটি বৈষম্যমূলক সমাজকাঠামো এবং সম্পদভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধার কারণে দারিদ্র্য বিমোচনের এ সমস্ত তথাগত প্রচেষ্টা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হয় না। দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে অত্যন্ত সচেতনভাবে উৎপাদনশীল আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পুঁজির ওপরে দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া কখনোই দারিদ্র্য কেবল প্রবৃদ্ধির মাঝে বিদূরিত হবে না। সুতরাং স্বল্প মেয়াদের যে কার্যক্রম বাজেটে উল্লেখিত হয়েছে তার মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আনতে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলকেই ঢেলে সাজাতে হবে। যার কথা অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ন্যাশনাল ফুড পলিসির ক্যাপাসিটি স্ট্রেনথেনিং প্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে খাদ্য নীতিমালা ১১টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে প্রণীত ও তাঁর অধীনে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি হবে বলে জানানো হয়েছে। উদ্দেশ্য খাদ্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি, খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ও খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনীর কলেবর বৃদ্ধি। লক্ষ্যণীয় এ সবই উপর থেকে দেয়া দান-অনুদানের ব্যাপার। এখানে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর কোনো অংশিদারিত্ব নেই, যার ফলে এ জাতীয় কার্যক্রম দীর্ঘায়িত হয় এবং খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত না হয়ে ও অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিত থেকে দারিদ্র্যের বিশেষ হেরফের হয় না।

অর্থমন্ত্রী শিল্পক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার চেয়েছেন। তিনি জিডিপিতে শিল্পের অংশ বর্তমান ১৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে প্রস্তাব করেছেন। আমাদের জনসংখ্যা, বেকারত্ব এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। স্মরণীয় যে, আমাদের দেশে প্রযুক্তি বিদেশ থেকে আনা হয়। বিদেশে এখন পুঁজিঘন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে এবং প্রবৃদ্ধি হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করে। সুতরাং আমাদের এখানে শিল্প প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের জন্য লাগসই শ্রমঘন প্রযুক্তি আমাদেরকেই উদ্ভাবন করতে হবে। সেজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে যথাযথ বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ খাতে এজন্য যথার্থ মানবসম্পদ সৃষ্টি প্রয়োজন এবং গবেষণার জন্য যথার্থ সুযোগ সৃষ্টিসহ শিল্প ও শিক্ষার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া প্রয়োজন। অর্থমন্ত্রী মূলত ব্যক্তি খাতের প্রসারণের মধ্যদিয়ে শিল্পখাতে উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন-কানুন পর্যাপ্ত সরবরাহ ও ঋণপ্রবাহকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শিল্পখাতের জন্য ইশতেহারে পাটশিল্পের পুনরুজ্জীবনের কথা বলা হলেও এ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেখা যায় না। আইটি, পোশাক, টেক্সটাইল, জাহাজ নির্মাণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ঔষধ, চামড়া ইত্যাদি খাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার যে বিষয়টি ইশতেহারে আছে সেটি সম্ভবত শিল্পনীতিতে আলোচিত হবে কিন্তু আইটি খাত ছাড়া অন্য খাতে বাজেট প্রস্তাবনায় বিশেষ উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় না। ইশতেহারে পুঁজি বাজারের বিকাশ সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তারই আলোকে অর্থমন্ত্রী পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়াতে সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানীর শেয়ার অফলোডি, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন মার্চেন্ট ব্যাংকের নিবন্ধন, মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণসহ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাবনা করেছেন। আশা করেছেন দেশী ও বিনিয়োগকারীগণ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত বোধ করবে এবং পুঁজিবাজার দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংগ্রহের উৎস হিসেবে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। এই সমস্ত প্রস্তাবনায় প্রশাসনিক জটিলতা দূরীকরণ এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি জেনেও উপেক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ করা যায়, পুঁজিবাজারে ছোট ও মাঝারি শিল্পের অংশগ্রহণ থাকে না। এসব শিল্প তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ওপর নির্ভর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে এদের ক্রমান্বয়িত উত্তরণের জন্য পুঁজিবাজারের ভিন্নতর সাংগঠনিক বিবর্তন প্রয়োজন। এদেশের যেহেতু ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের সংখ্যা অনেক বেশি, এক্ষেত্রে শ্রমিকের ও সমবায়ীদের মালিকানা নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ প্রস্তাবনার প্রয়োজন রয়েছে, তা না হলে পুঁজিঘন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে আয় বৈষম্য ও ধন বৈষম্যের সাথে সামাজিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। ৭২'এর সংবিধানের মালিকানা সম্পর্কিত ধারণা এ প্রস্তাবনায় গুরুত্ব পায়নি।

শিল্প বিকাশের জন্য প্রয়োজন হলো বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিকাশ এবং এক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি নৈরাশ্যজনক। সার্কভুক্ত দেশের তুলনায় আমাদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহার অতি নগণ্য। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হয়েছে, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য অতিরিক্ত লাইন স্থাপনের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনে সম্ভাব্য সকল উৎস ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবও করা হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু জ্বালানী উৎপাদন, সংরক্ষণ, আমদানী বিতরণ এবং বিভিন্ন খাতের ব্যবহার সম্পর্কিত পরিবেশবান্ধব, গৃহস্থালীবান্ধব, ক্ষুদ্রশিল্পবান্ধব একটি নীতি। ইশতেহারে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধান ও পশ্চিমাঞ্চলে এলপিজি সরবরাহের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবনায় ২০১৩ সাল নাগাদ ৫০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের প্রস্তাবনা রয়েছে। বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সংরক্ষণের প্রস্তাবনায় সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহারের দিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবনা থেকে অনুমান হয় সরকারি খাতের চাইতে বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভরতা বাড়বে। পুঁজির চাহিদার কারণে এটা স্বাভাবিক মনে হলেও উন্নয়নের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণে যেন যথাযথ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং কোনো গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্য বা সিন্ডিকেশনের সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সুষম উন্নয়নের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অতীতে সড়ক ও সেতুর দ্রুত সম্প্রসারণ দেখেছি। কিন্তু নৌপথ ও রেলপথ অবহেলার শিকার থেকে গেছে। ইশতেহারে সড়ক নির্মাণ, বন্দর নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ সম্প্রসারণ, স্বল্প ব্যয়ে যাতায়াত, এশীয় ও এশীয় হাইওয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, ঢাকা শহরে পাতাল রেলসহ যানজট নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নদী পুনর্খননের কথা বলা হয়েছে। বাজেটে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রস্তাবনাও রাখা হয়েছে এবং এখাতে বেসরকারি অংশিদারিত্বের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। রেলওয়েকে কর্পোরেট সংস্থায় রূপান্তরিত করে দূরপাল্লার যাতায়াতকে ঢেলে সাজানো ও রেলপথ সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। নৌপথকে নিরাপদ ও নাব্য রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজ সাপ্লাই অপারেট এন্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থল বন্দরগুলোকে বিওটি'র আওতায় উন্নয়নের প্রস্তাবও করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ খাতে ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযুক্ত করা দেশব্যাপী ফাইবার সংযোগ স্থাপনসহ তার ও টেলিযোগাযোগের কাঠামোকে উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। এখাতে বেসামরিক বিমান ও পরিবহন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবনাও রয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, আইসিটি বিষয়টি শিল্পায়ন, যোগাযোগ, গ্রামীণ উন্নয়ন সমস্ত খাতেই ব্যাপৃত হয়ে আছে। এই প্রযুক্তির সম্প্রসারণের জন্য এক্ষেত্রে শিক্ষার সম্প্রসারণ গবেষণা এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

বাজেট প্রস্তাবনায় মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য এবং এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর, কারিগরি, পেশাগত শিক্ষা সব বিষয়েই সুযোগ সম্প্রসারণের প্রস্তাবনা রয়েছে। আমাদের শিক্ষাকে জীবনঘনিষ্ঠ, বিজ্ঞানমুখি, ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সক্ষমতা অর্জনের দিকে সবিশেষ দৃষ্টির প্রয়োজন আছে। আমরা এখনো সবার জন্য শিক্ষাকে নিশ্চিত করতে পারি নি। কমিউনিটি বিদ্যালয় এবং অনেক সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় শিক্ষার যথাযথ উপকরণ ও শিক্ষকের অভাবে মানহীন শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেনি। উচ্চশিক্ষায় জনগণের অংশগ্রহণও সীমিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাণিজ্য ও সাধারণ শিক্ষার চাইতে তুলনামূলকভাবে কম। বিজ্ঞান শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত। বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষিত শিক্ষকের দারুন অভাব। কার্যকর পাঠ্যক্রম এবং সৃজনশীল ক্ষমতাসৃষ্টিকারী শিক্ষাক্রম এখন পর্যন্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেও ছাত্র-শিক্ষকের নিকট পৌঁছেনি। দারিদ্র্য এখনো শিক্ষায় অংশগ্রহণকে সীমিত করে রেখেছে। এ সমস্ত সমস্যা উত্তরণের জন্য সমন্বিত শিক্ষা নীতির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী ও আধিবাসীদের জন্য যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। ইশতেহারে মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। সেইসাথে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষাঙ্গনকে দলীয়করণমুক্ত, শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর বেতনকাঠামো, স্বতন্ত্র কর্মকমিশন এবং পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। যে দেশে ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমান এবং তিন ধরনের শিক্ষার মাধ্যম উপস্থিত এবং যেখানে শিক্ষাকে পণ্য করে বিনিয়োগের একটি বেসরকারি প্রচেষ্টা তীব্র হয়ে উঠছে সেখানে অবৈতনিক সেবা, স্বতন্ত্র কর্মকমিশন, উচ্চতর বেতন কাঠামো, শিক্ষার মানোন্নয়ন ইত্যাদির সমন্বয় সমস্যাসঙ্কুল। বর্তমানের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষার সম্প্রসারণ, বেসরকারি খাতে শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি, বিনামূল্যে বই বিতরণ, বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ, উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং ছাড়া মৌলিক বিষয়ের দিকে তেমন কোনো দৃষ্টিপাত করা হয় নি। আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যে বিশাল বিনিয়োগ ও পুনঃচলমান খরচ মেটানোর অর্থসংস্থান প্রয়োজন সে বিষয়ে কোনো আলোচনাই ইশতেহারে বা বাজেট প্রস্তাবনায় লক্ষ্য করা যায় না।

ইশতেহারে স্বাস্থ্যনীতির পুনর্মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার সেখানে নাই। বাজেট প্রস্তাবনায় কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের কাছে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক নিয়োগ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কারণ সকলেই বড় শহরের আকর্ষণে এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা খাতের সুযোগ গ্রহণে অধিকতর আগ্রহী। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য আমাদের পাকিস্তান আমলেও এলএমএফ ডাক্তারদের সাহায্যে গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ডাক্তারদের স্বাস্থ্য খাতের যে অবহেলা দেখানো হয় সে নীতি চলমান থাকলে কমিউনিটি ক্লিনিক অথবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য অফিসার দেয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে। এছাড়াও নার্স ও প্যারামেডিক এবং হেলথ টেকনোলজিস্টদের যথাযথ প্রণোদনা, মর্যাদা ও উৎসাহ দেয়া হয় না বলে এসবক্ষেত্রে মেধাসম্পন্ন লোকের অভাব দেখা যায়। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে কেবল ভৌত অবকাঠামো যথেষ্ট নয়। এখানে মানবসম্পদ অবকাঠামোই প্রকৃত ভিত্তি। সেই মানবসম্পদের সৃষ্টি, উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও যথাযথ প্রণোদনা দেয়ার কোনো সার্বিক পরিকল্পনা ইশতেহারে ও বাজেট প্রস্তাবনায় দেখা যায় না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা একটি অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র। কিন্তু বেসরকারি খাতে অবকাঠামোগত সুবিধা ছাড়াই যে জাতীয় প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ ঘটেছে সেগুলো জরুরিভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন এবং মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে দরিদ্র নিঃস্ব গর্ভবতী মহিলাদের কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাহায্যে সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এছাড়া শিশুমৃত্যুর হার এবং মাতৃমৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হবে না। অপুষ্টি সমস্যা সমাধান করতে হলে মূলত দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতাকেই দূর করতে

হবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গবেষণা ও নিরীক্ষার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রসারণ প্রয়োজন। কিন্তু সুযোগের ক্ষেত্রে দলীয় নয়, মেধাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ঔষধ নীতির ক্ষেত্রেও সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে মানসম্পন্ন ঔষধের লক্ষ্যতা নিশ্চিত করা না গেলে বিদেশে রপ্তানির স্বার্থে এক্ষেত্রে সম্প্রসারণ আমাদের কোনো কাজে আসবে না। বাজেটে রোগী কল্যাণ তহবিল, ডিজিটাল পাস কার্ড ছাড়াও ইউজার ফি'র প্রস্তাবনা করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে যখন অবৈতনিক শিক্ষা স্নাতক পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব হচ্ছে তখন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে ইউজার ফি'র প্রস্তাবনা এই দারিদ্র্য পীড়িত দেশে আছে বলে মনে হয় না। স্মরণীয় যে, ইউজার ফি'র প্রবর্তনের পর আফ্রিকা মহাদেশে গড় আয়ু, অসুস্থতা এবং স্বাস্থ্য সেবা না পেয়ে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে একই কারণে গড় আয়ু কমেছে, অসুস্থতার হার বেড়েছে এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হারও আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। যেখানে রোগী কল্যাণ তহবিলের কথা বলা হয়েছে সেখানে দরিদ্র এবং নিঃস্ব মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছাতে হলে এই ইউজার ফি'র প্রস্তাবনা সমর্থনীয় নয় এবং এটি ইশতেহারের জনকল্যাণমুখি নীতির সামগ্রিক প্রস্তাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বাজেট প্রস্তাবনায় নারী কীভাবে বাজেটের মাধ্যমে উপকৃত হয় তার একটি আলোচনা সংযুক্ত হয়েছে। এটাকে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের উদাহরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেন্ডার টার্গেটেড বরাদ্দ ছাড়াও জেন্ডার নিউট্রাল প্রকল্প থেকে নারীরা উপকৃত হন। কারণ সে প্রকল্পগুলো সকল মানুষের জন্য। অবশ্য কতটুকু উপকৃত হন সেটা নির্ভর করে অংশগ্রহণের ওপরে। সে কারণে যেমন জেন্ডার টার্গেটেড প্রকল্পের ব্যবস্থা থাকতে হবে, তেমনি জেন্ডার নিউট্রাল প্রকল্পগুলোতে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বাড়াতে হবে। প্রকল্প প্রণয়নে এ কারণে কেবল টেকনিক্যাল সম্ভাবনা ও প্রস্তাবনা ছাড়াও পরিবেশবান্ধব বিবেচনার মতোই জেন্ডার সংবেদনশীলতা সামাজিক অভিঘাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন কৌশলে অনেক কৌশলগত পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত না করে কেবলমাত্র বরাদ্দ দেখিয়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা স্বপ্রমাণ করা যায় না। আমাদের বাজেট প্রস্তাবনায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত করা, নারীদের পদায়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া, নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নেয়া এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধের সদিচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষমতায়নের জন্য শিশুর অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রস্ফুটিত প্রস্তাবনার প্রয়োজন রয়েছে, যেটি বাজেট প্রস্তাবনায় লক্ষ্যণীয় নয়। ইশতেহারে নারীর সম-অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'নারী উন্নয়ন নীতি' পুনর্বহাল এবং নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সকল বৈষম্যমূলক আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবনায় এ সকল বিষয়ে কোনো পদক্ষেপের উল্লেখ নাই। সম্ভবত এটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নির্বাহি কার্যক্রমের মধ্যে আবৃত আছে।

ইশতেহারে দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য কোনো ব্যবস্থার উল্লেখ না থাকলেও ন্যূনতম মুজরি পুনর্নির্ধারণ, শ্রমনীতি পুনর্মুল্যায়ন আন্তর্জাতির চাহিদা অনুযায়ী শ্রমশক্তি রপ্তানী, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিশ্চিতকরণ, ভূমিহীন খেত মজুরসহ সকল শ্রমিকের জন্য রেশনিং প্রথা চালুর প্রস্তাব রয়েছে। বাজেট উপস্থাপনায় প্রবাসী কল্যাণ নিশ্চিত করা, দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন ছাড়া শ্রমিকদের ব্যাপার সাধারণত উপেক্ষিত। পুঁজিবাজারের দিকে অর্থমন্ত্রীর যতটা দৃষ্টি শ্রমবাজারের সাংগঠনিক অব্যবস্থার দিকে তেমন কোনো দৃষ্টি ছিল বলে মনে হয় না। অথচ আমরা শ্রমঘন শিল্প গড়তে চাইছি, এদেশের সকল কৃষক-শ্রমিককের কল্যাণ নিশ্চিত করতে চাইছি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় – ভোটের রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক অর্তনীতিতে একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান।

পরিবেশ জলবায়ু সঙ্কটের কারণে এখন একটি বহুল আলোচিত বিষয়। ইশতেহারে নদী-খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙন রোধ, পানি সংরক্ষণ, বনাঞ্চল রক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথা বলা আছে। বাজেট প্রস্তাবনায় জলবায়ু পরিবর্তনের যে বিরূপ প্রভাব কৃষি, মৎস্য ও জীব বৈচিত্র্যের ওপর পড়েছে সে বিষয়ে কর্ম-পরিকল্পনা ও কৌশলের পর্যালোচনার কথা বলা হয়েছে। এ সাথে আসছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় নিজস্ব উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সমুন্নয়নের কথা। বিপর্যয় মোকাবেলায় তহবিল গঠনের কথা উল্লেখ আছে। ২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ভূমি বনায়ন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বনায়নের ক্ষেত্রে সমাজিক বনায়নকে প্রকৃতি প্রদত্ত বন এবং রিজার্ভ বনাঞ্চলকে আলাদা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। চা বাগানের সাথে যে বনাঞ্চল আছে সেটাও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। পাবর্ত্য অঞ্চলে নতুন অর্থকরী ফসলের নামে যে রাবার বাগান বা চা বাগান বা আনারস এবং তামাক চাষ হচ্ছে, তার ফলে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে – সে বিষয়টিও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। সুন্দরবন এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন, যেটা আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করবে। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন সৃষ্টি প্রাগ্রাধিকার পাওয়া প্রয়োজন। বাজেটের উপস্থাপনায় সুন্দরবন ছাড়া অন্য বিষয়গুলো যথাযথ উল্লেখ পায় নি। বাজেট বক্তৃতায় নৌ-পথ উন্নয়ন, পানি সম্পদের সংরক্ষণ ও যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা, লবণাক্ততা প্রতিরোধ, জলাবদ্ধতা দূর এবং বন্যামুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি, সেচ-সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী ভাঙন রোধ – এ সবেরই উল্লেখ আছে। কিন্তু চলন বিল, বিভিন্ন হাওর অঞ্চল, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী ও ভরাট করা জলাশয় উদ্ধার এসব দিকে উল্লেখ যেমন কম বরাদ্দও তেমনই কম। পরিবেশ দুষণে শব্দদুষণ, বায়ুদুষণ, ঘরের অভ্যন্তরের পরিবেশ দুষণ, হাসপাতালের বর্জ্য এবং গৃহস্থালীর বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির বিষয়ে আরো দৃষ্টি দিলে স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব, পরিকল্পিত নগর সম্ভব হয়ে উঠবে। বাজেটে এদিকে যথাযথ দৃষ্টি নেই।

এসবেরই মূলে আছে সুশাসনের প্রশ্ন। মানুষের মনে সুশাসনের অভাবে সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো দুর্নীতির অভাবনীয় বিস্তার। দুর্নীতির ব্যাপারে ইশতেহারে ঘুষ ও দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয় বন্ধ, ঋণখেলাপী, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, পেশীশক্তি ও কালোটাকার মালিকদের প্রতিরোধের উল্লেখ আছে। বাজেটে মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুন্ন না করে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে জোরদার করার কথা বলা হয়েছে, সরকারের ক্রয়সহ সকল কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কথাও উচ্চারিত হয়েছে। সম্প্রতি পিপিআর সরকারি ক্রয়ের ব্যাপারে নীতির পরিবর্তন আমাদেরকে এ ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করে। রাজনীতিবিদদের দুদকবিরোধী উচ্চারণ দুদকে'র স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে না, শক্তিশালী করা তো দূরের কথা। দুদকে'র রুজুকৃত মামলা প্রত্যাহারের বিষয়টিও আমাদেরকে সংশয়িত করে। বাজেট প্রস্তাবনায় সংসদকে কার্যকর করার ব্যাপারে স্থায়ী কমিটি গঠন এবং নানা অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করার উল্লেখ আছে। পেশানিষ্ঠ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাবনাও করা হয়েছে। সে কারণে সরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর

দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য ও সহযোগিতা দেয়ার প্রস্তাবও আছে। নির্বাচনী ইশতেহারে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে শক্তহাতে দমন করার উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে কি কার্যক্রম নেয়া হবে তার কোনো বিস্তারিত উল্লেখ নাই। আমাদের দেশে সম্প্রতিককালে বিডিআর বিদ্রোহ এবং তার পুনর্গঠনের বিষয়ে র‍্যাবের নানান কার্যক্রম, পুলিশ বাহিনীর ও প্রশাসনের বিভিন্ন দরিদ্র ও অসহায় মানুষবিরোধী অবস্থান ইশতেহারে ঘোষিত সুশাসন অংশে এবং অর্থমন্ত্রীর উচ্চারণে আমরা যথেষ্ট স্বস্তি পাই না। পৃথিবীর সাতটি দেশের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বিবেচনা করে বাংলাদেশকে সবচেয়ে কম দরিদ্রবান্ধব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুশাসনের বঞ্চিত মানুষের অনুচ্চ কণ্ঠ যদি শ্রুত না হয় তাহলে সুশাসন নিশ্চিত করা অসম্ভব। আইনের শাসনের ক্ষেত্রেও আমরা এখনো পৃথকীকৃত শক্তিশালী এবং দরিদ্রবান্ধব বিচারব্যবস্থা দেখতে পাই না। মানুষের কাছের সরকার স্থানীয় সরকার এখন সংসদ সদস্যদের আগ্রাসনের শিকার। যদিও নির্বাচনী ইশতেহারে ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও জেলা পরিষদে ক্ষমতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করার অঙ্গিকার করা হয়েছিল। অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোই থাকবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে এবং তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিকেন্দ্রিকৃত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর এই প্রস্তাবনা সংসদ সদস্যদের সর্বক্ষেত্রে উপস্থিতিকে নাকচ করে দেয় এবং ইশতেহারে সরকারি দলের যে প্রতিশ্রুতি সেটার বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে।

এবারের বাজেট ধারাবাহিকতার বাজেট। বাজেটের নতুন দিক হচ্ছে সরকারের রাজনৈতিক নীতিমালা বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস। বিশেষ করে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারকে বাজেট আলোচনায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর তা বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়েই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাজেটে অপ্রদর্শিত আয় বা কালো টাকা বৈধ করার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে তা নীতি ও নৈতিকতার দিক থেকে কতটা ঠিক হয়েছে সেটাও ভাবনার বিষয়। বাজেট যত বড়ই হোক না কেন সেটা যথাযথ বাস্তবায়নে সরকার কতটা সফল হবে সেটা দেখতে হবে। এবারের বাজেটে সরকারি বেসরকারি অংশিদারিত্বকে নতুন বলা হচ্ছে, আসলে এটা নতুন কিছু নয়। এর আগেও বিষয়টি আমাদের বাজেটগুলোতে ছিল। তবে তা উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে ঢোকানো থাকতো। এর অধীনে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হতো সেগুলো বিওপি, বিওটির আওতায় বাস্তবায়ন হতো। তবে একটি দিক থেকে এটিকে নতুন বলে দাবি করার চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে। আর সেটা হচ্ছে, এবারই প্রথম এটাকে আলাদা খাত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক গুরুত্বের বিবেচনায়ও এটি নতুন হতে পারে। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টি একটি কার্যকর দিক। এটি যে নতুন কিছু নয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেও তার প্রমাণ মেলে। তিনি বলেছেন, এ ব্যবস্থা বিশ্বের অনেক দেশেও চালু আছে। এবারের বাজেটে তিনি মন্ত্রণালয় ধরে ধরে কথা বলেছেন। সেখানে আওয়ামী বা মহাজোট সরকারের জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি তার প্রেক্ষাপটে তিনি তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছেন। এর আগের বাজেটগুলোতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় দায়িত্বগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হতো না। এর ফলে বাজেট বাস্তবায়নে কোন মন্ত্রণালয়ের দায় কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ থাকতো না। এবারের বাজেটে কোন কোন মন্ত্রণালয়ের কি কি কাজ এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন করতে হবে সেই সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে, সেইসব বিষয় চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। এতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার যে জায়গা তৈরির প্রয়াস চালানো হয়েছে তা কার্যকর করা গেলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে একটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেলে ভালো হতো। তিনি বাজেট তৈরির সময় এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিশ্চয়ই আলোচনা করেছেন। তবে এসব বিষয়ে মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে আলোচনা করেছেন কি-না জানি না, আলোচনা করলে ভালো। কারণ মন্ত্রণালয়ের ওউনারশীপ নিশ্চিত করা না গেলে প্রকল্প বাস্তবায়ন দুরূহ হয়ে পড়ে, ফলে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হয় না।

আমরা নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে বাজেটে প্রস্তাবিত বিভিন্ন পদক্ষেপের আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অর্থমন্ত্রী ম্যাক্রো ফ্রেমওয়ার্কের চাইতে খাতওয়ারী যে সমস্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ইশতেহারে দেয়া হয়েছে সেদিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়েছেন। একথা বলা যায় যে, ইশতেহারে অনেকক্ষেত্রেই কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ছিল। একই উদ্দেশ্য অর্জনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে নানা প্রস্তাবনা রেখেছেন। তিনি বিকল্পগুলো বিবেচনা করেছেন কি-না সেটা পরিচ্ছন্ন নয়। এই কারণে ইক্যুইটি ও এফিসিয়েন্সির বিবেচনা একেবারেই অনুপস্থিত। অন্যদিকে এটাও লক্ষ্যণীয়, বাজেট বিবেচনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইশতেহারের নানা প্রতিশ্রুতি অনেক বেশিই গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন: কৃষি খাত, শিল্প খাতের চাইতে সঙ্গত কারণেই অধিক বিবেচনার দাবিদার হয়েছে। একইভাবে ই-গর্ভান্সের ব্যাপারে বাজেট ব্যবস্থাপনায় অনেক উচ্চারণ লক্ষ্যণীয়। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিদ্যমান নানা কৌশলকে প্রসারিত করার বিষয়টি যত সহজে বলা যায়, তত সহজে জ্বালানী নিরাপত্তার বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা উপস্থাপিত করা অধিক কষ্টসাধ্য। দারিদ্র্য নিরসন সম্পর্কে বিদ্যমান নানা প্রকল্প ও কর্মকৌশল থাকায় সে বিষয়ে আলোচনা অনেক সহজ হয়েছে। যোগাযোগ খাতে নানা প্রস্তাবনা এসেছে, যদিও এ বিষয়ে ইশতেহারে তেমন বিস্তৃত ধারণা দেয়া হয়নি। মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে যত সহজে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, একইভাবে স্বাস্থ্য খাত নিয়ে বিবেচনায় অনেক ঘাটতি লক্ষ্যণীয়। এ বিষয়ে আমাদের উপরে যে আলোচনা তা থেকে এই উপসংহার টানা সম্ভব যে, ইশতেহারে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহের যেহেতু অগ্রাধিকারভিত্তিক কোনো নির্দেশনা ছিল না, সেহেতু বাজেটে অর্থব্যয় প্রাক্কলনে এ বিষয়টি ধারাবাহিকতার কারণে উপেক্ষিত থেকে গেল। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতের যে বাজেট নির্মাণ ও কাঠামোর ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন তার ফলে ইশতেহারে বর্ণিত নানা ইচ্ছার সাথে প্রবৃদ্ধি ও বৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করার জন্য যে চলমান ম্যাক্রো কাঠামো নির্মাণ করা হবে, তার মাধ্যমে একটি সুসমন্বিত বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হবে – যেখানে ইউনিয়ন থেকে সকল স্থানীয় সরকারের পর্যায়ে নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ব্যয় ও সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং তারই মাধ্যমে উন্নীত একটি আর্থসামাজিক বিবর্তনসহ ভৌত ও সামাজিক পুঁজির বিকাশের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য, আন্তঃসামাজিক বৈষম্য দূর করে সবার জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা যাবে। বর্তমান বাজেটে এই সমন্বয়টির অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে অর্থমন্ত্রী নির্বাচনকালে দেয় প্রতিশ্রুতির প্রতি যে গুরুত্ব দিয়েছেন সেটি ভবিষ্যতে বাজেট প্রণয়নে ও তার বিবেচনায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেই আশা করি।